# গোপন মায়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

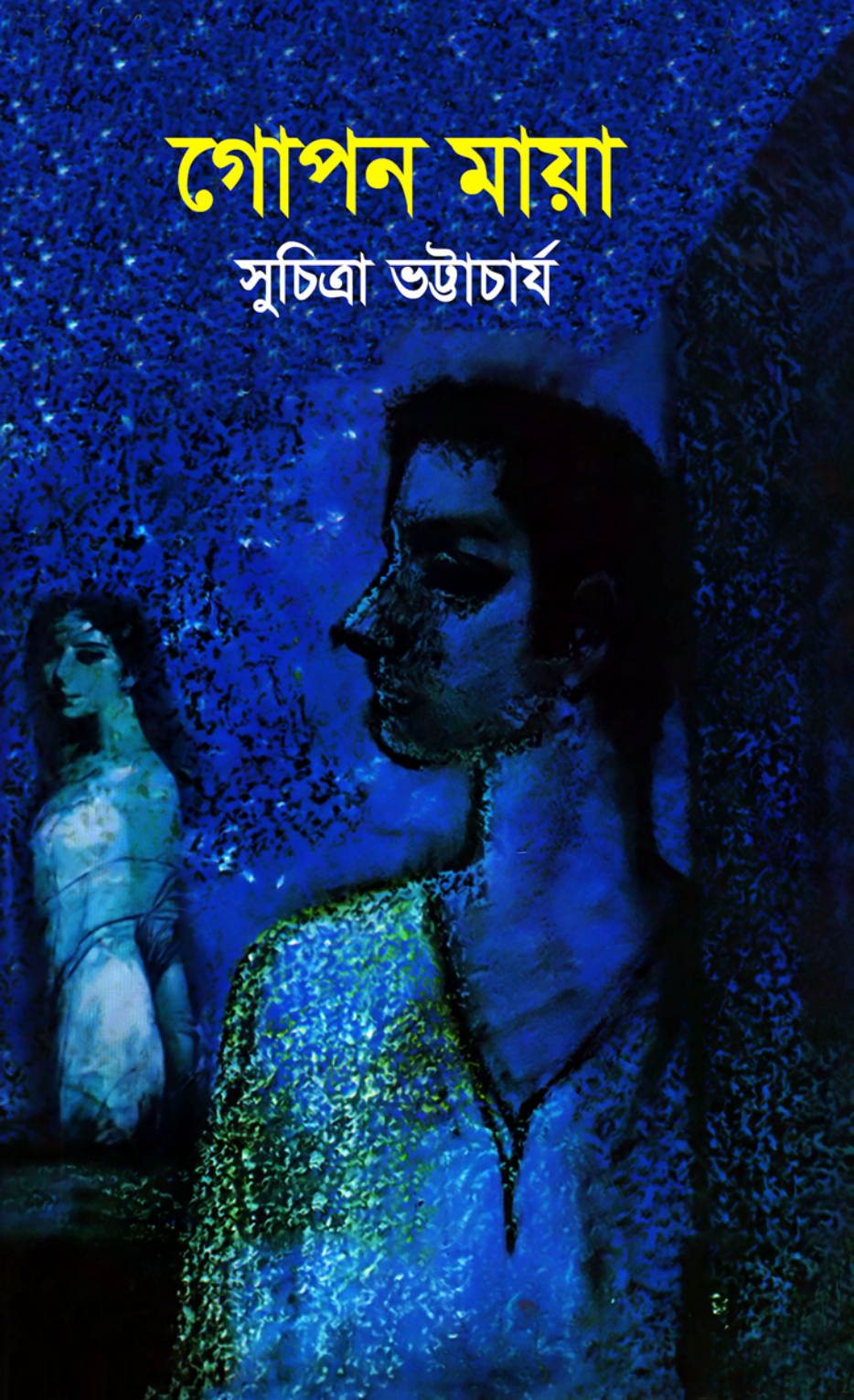

# গোপন মায়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

# গোপন মায়া

মানিকের মা কাজে এল না আজ। অপেক্ষা করে করে দশটা নাগাদ নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল রঞ্জন। তাড়া অবশ্য নেই, রান্না আরো পরে চাপালেও চলে, কিন্তু ছুটির সকালে একা ফ্ল্যাটে সে এখন করবেই বা কী? টিভি দেখবে বসে বসে? একঘেয়ে, ভীষণ একঘেয়ে। বই পড়বে? ক্লান্তিকর। গান শুনবে? ইচ্ছে করছে না। গড়াগড়ি খাবে বিছানায়? তাও ভালো লাগছে না। আবার উল্টোবে খবরের কাগজ? ধুৎ। তারচেয়ে বরং এই রান্না রান্না খেলাটা কি মন্দের ভালো নয়?

রঞ্জন একটা মেনু এঁচে নিল মনে মনে। মেন আইটেম ডিমের ঝোল আর ভাত। সঙ্গে মুগডাল আলুভর্তা। ডালে সম্বর দেওয়া নিয়ে অবশ্য একটু সমস্যা হয়। পনেরো বছর একা বাস করেও কায়দাটা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। হয় জিরে বেশি পুড়ে যায়, নয় শুকনো লঙ্কা ভাজা হয় না ঠিক ঠিক। আর হলুদ-আদার আন্দাজ তো কখনোই নিখুঁত থাকে না। যাক গে যাক, সে নিজেই তো খাবে, আজ আর একবার চেষ্টা চালানোই যায়।

ভাবতে ভাবতে হাত চলছে। রাতের থালাবাটিগুলো মেজে ফেলল রঞ্জন। সকালের চা-জলখাবারের কাপপ্লেটও। রান্নাঘরের ওয়াল-ক্যাবিনেট খুলে জরিপ করল মশলাপাতির হাল। আছে। গুঁড়ো-হলুদ, গুঁড়ো-লঙ্কা, গরমমশলা, সবই মজুত। শুধু পেঁয়াজ আদা রসুন মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই হাঙ্গামা শেষ।

কড়াইতে ডিম-আলু সেদ্ধ বসিয়ে রঞ্জন পেঁয়াজ নিয়ে পড়ল। খোসা ছাড়াল মন দিয়ে। কুঁচোচ্ছে। ওফ্, কী ঝাঁঝ! বেদনার পরাকাষ্ঠা! হাতের পিঠে বারবার চোখ মুছছে রঞ্জন। নাক টানছে।

কলিংবেল বেজে উঠল। রঞ্জনের ভুরুতে কুঞ্চন। মানিকের মা নিশ্চয়ই আর এত বেলায় আসবে না! তবে কে? দীপংকর? ব্যাটা সল্টলেকে ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে হানা দেয় মাঝেমধ্যে। গৌরবও হতে পারে। কিংবা আজিজুল। বাচেলার বনে যাওয়া বন্ধুর এই ফাঁকা ফ্ল্যাটের মতো তোফা আড্ডার ঠেক কটাই বা আছে! প্রাণের সুখে গুলতানি মারো, কাপের পর কাপ চা বলো আর ওড়াও, কিংবা বোতল খুলে বসে পড়ো, এখানে তো তেমন কেউ নেই যে তোমায় ঠেলা মেরে ভাগাবে।

চিন্তাটায় যেন একটা চোরা বিষাদও আছে। ছোট শ্বাস ফেলে দরজা খুলতে গেল রঞ্জন।

পাল্লা টেনেই রঞ্জন হতচকিত। চৌকাঠের ওপারে এক ঝকঝকে তরুণী। পরণে কালোর ওপর জংলা ছাপ। লং-স্কার্ট, টুকটুকে লাল টপ, কাঁধে বাহারি ব্যাগ। মুখটা যেন খুব চেনাচেনা! কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

প্রশ্ন করার আগে মেয়েটিই সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনিই নিশ্চয়ই রঞ্জন মজুমদার?

হতভম্ব রঞ্জন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ....

—আমি মিমি। আই মিন মধুরিমা। আমার মায়ের নাম স্বাগতা। আশা করি এর বেশি পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই?

রঞ্জন পলকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। কী শুনল সে? ভুল নয় তো? মিমি...মিমি এসেছে তার কাছে? যে-মেয়েকে একটিবার দেখার জন্য একসময়ে সে মাথা

খুঁড়েছে, হতাশ হয়ে হালও ছেড়ে দিয়েছে কবে যেন, সে আজ স্বয়ং রঞ্জনের দরজায় হাজির! এও কি সম্ভব? নাকি দিবাস্বপ্ন দেখছে রঞ্জন?

অস্ফুটে রঞ্জন বলল, ও...। এসো, ভেতরে এসো।

—সরি। এখানেই ঠিক আছে। আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছিলাম।

অবিকল স্বাগতার গলা। বাচনভঙ্গিও হুবহু স্বাগতার। সেই ঝনঝনে তেজ। সেই একই রকম কাঠিন্য।

রঞ্জনের বুকটা চিনচিন করে উঠল। তবু জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। খানিকটা নাটুকে ভঙ্গিতেই বলে ফেলল, আমার দরজা থেকেই ফিরে যাবে তুমি? একবারটি ভেতরে পা রাখবে না?

প্রার্থনায় কি খুব বেশি আকুতি ছিল? মিমি যেন ক্ষণিক দোটানায়। স্থির চোখে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করল একটু। কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল, বুঝি গড়ে নিল ভাবনার সূক্ষ্ম অবকাশ। তারপর গুমগুমে গলায় বলল, অলরাইট। চলুন। তবে আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না।

—এসো তো।

দু-কামরার ফ্ল্যাটের ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসটুকু বড্ড অগোছালো হয়ে আছে আজ। বেতের সোফায় যেমন-তেমন ছড়ানো ইংরিজি-বাংলা খবরের কাগজ। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেঁড়া খাম, খালি সিগারেটের প্যাকেট। দু-দুখানা অ্যাশট্রে, দুটোই টইটুম্বুর। টিভির ওপর জলের বোতল। শোকেসের মাথায় ম্যাগাজিনের স্তূপ। ফাঁকা হুইস্কির বোতল শোভা পাচ্ছে টেলিফোনের পাশে। দেখে শিশুও বুঝবে এ এক ছন্নছাড়ার সংসার।

খবরের কাগজগুলো ঝটপট সরাতে গিয়ে রঞ্জনের খেয়াল হল আনাজ কাটার ছুরিটাও হাতে ধরা আছে এখনো। মেয়েটাও যেন তেরচা চোখে দেখছে অস্ত্রখানা। অপ্রস্তুত স্বরে রঞ্জন বলল, পেঁয়াজ কাটছিলাম। রেখে আসতে ভুলে গেছি।

মিমি হাসল না। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

খপ করে বোতলটা তুলে নিয়ে রঞ্জন ত্বরিত পায়ে রান্নাঘরে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। বুকে খানিকটা বাতাস ভরে স্থিত করল নিজেকে। বোতল নামাল

সিংকে, ছুরি যথাস্থানে। পায়ে পায়ে ফিরল ঘরে। সোফা ঝাড়ছে। মৃদুস্বরে বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।...জল খাবে?

—নো থ্যাংকস্।

মিমি বসেছে আড়ষ্টভাবে। দেওয়ালে রঞ্জনের কাঁধে আড়াই বছরের মিমি, সেদিকে ঝলক তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কপালে চওড়া চওড়া ভাঁজ ফেলে বলল, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন?

রঞ্জন যেন ঠিক শুনতে পেল্ না। মিমিকে দেখছে নিষ্পলক। কত বড় হয়ে গেছে তার মেয়েটা! সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফোলা-ফোলা গাল, গাবলুগুবলু মিমির সঙ্গে এই মিমির মিল পাওয়া ভার। সামান্য লম্বাটে মুখ, সরু কপাল, পাতলা-পাতলা নাক, ঈষৎ-চাপা ঠোঁট, আয়ত চোখ আর কাঁধছোঁয়া চুলে শ্যামলারঙা মিমি এখন অন্যরকম। কার মতন হয়েছে মিমি? স্বাগতা? উঁহু, স্বাগতার মুখ তো গোল। রঙও অনেক ফর্সা স্বাগতার। বরং মিমির এই মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মায়ের আদলই মেলে বেশি। মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেও মেয়ের চেহারাটাকে মনোমত বদলাতে পারেনি স্বাগতা, যাদের সে অসম্ভব অপছন্দ করত তাদেরই একজন রয়ে গেল মিমির অবয়বে।

মিমির কপালের ভাঁজ ক্রমশ ঘনতর। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আমি কিন্তু কোনো সারপ্রাইজ দেওয়ার উদ্দেশে এখানে আসিনি। ইনফ্যাক্ট, আমার মা-ও জানে না...জানলে অবশ্যই আমার আসাটা অ্যালাও করত না।

রঞ্জনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তাহলে এলে কেন?

—ওই যে বললাম... একটা ইম্পরট্যান্ট কাজে। আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল।

—কী বল ত?

—আপনি একসময়ে একটা ইনশিওরেন্স করিয়েছিলেন। আমার নামে। আঠারো বছরের পলিসি। মিমি এতক্ষণে সরাসরি তাকিয়েছে,—মনে পড়ে কি?

মিমি কোনদিকে কথা ঠেলতে চাইছে বুঝতে পারছিল না রঞ্জন। সত্যি বলতে কী, এখনো তার বোধবুদ্ধি সেভাবে ক্রিয়া করছে না। মিমির

আকস্মিক উপস্থিতিতে এখনো যেন ধাতস্থ হয়নি মগজে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে বলল, হ্যাঁ, একটা করেছিলাম বটে। আমার মেয়ে যাতে বড় হয়ে লাম্পসাম একটা অ্যামাউন্ট পায়...। তার হায়ার এডুকেশনের জন্য....কিংবা...।

—পলিসিটা ম্যাচিওর করেছে।

—বাহ্, ভাল তো।

—না, ভাল নয়। এ টাকা আমার চাই না।

বাক্যটা এমন তীক্ষ্ণভাবে ছুড়ল মিমি, ক্ষণিকের জন্য রঞ্জন যেন শরাহত। অতি কষ্টে হজম করল আঘাতটা। জিজ্ঞেস করল, কেন নেবে না, জানতে পারি কি?

—কেন নেব তার কোনো আনসার আপনার কাছে আছে কি?

নাহ্, এ মেয়ে রঞ্জনকে ক্ষতবিক্ষত করতেই এসেছে আজ। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলল রঞ্জন। ধরিয়েও ফেলল একটা ফস করে। টের পেল জ্বলন্ত সিগারেট আঙুলের ফাঁকে কাঁপছে টিপটিপ। একটা ক্রোধও যেন কোত্থেকে ধেয়ে আসে মস্তিষ্কে। স্বাগতা শুধু মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যত্ন করে তাকে শিখিয়েছে কীভাবে রঞ্জনকে অবজ্ঞা করতে হয়। অবজ্ঞা? না ঘৃণা?

চোখের কোণ দিয়ে রঞ্জনকে দেখছে মিমি। বোধহয় তৃণ হাতড়াচ্ছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে আবার কোনো তির হানার। মাথায় একরাশ ধোঁয়া পাঠিয়ে রঞ্জন খানিকটা লাগামে আনল নিজেকে। গোছালো। তবু ঝাঁঝ একটু এসেই গেল গলায়, আমার কাছে অনেক উত্তরই আছে মিমি। তুমি কি সেগুলো শুনতে চাও?

মিমি ঘাড় ফেরাল দেওয়ালের দিকে। কঠিন চোয়ালে উপেক্ষা।

রঞ্জন মরিয়াভাবে বলল, কোয়েশ্চেন করলে রিপ্লাইয়ের জন্যও তৈরি থাকতে হয় মিমি। নইলে কিন্তু যাকে প্রশ্ন করছ তার প্রতি অবিচার করা হয়।

মিমি তবু নীরব। ঠোঁট কামড়াচ্ছে। বিরক্তি চাপছে কি?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নেবাল রঞ্জন। চেপে চেপে। নাহ্, সে বোধহয় একটু বেশিই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে। পনেরো বছর পর মেয়েকে আচমকা সামনে পেয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য ছটফট করাটা কি

ছেলেমানুষি নয়? আর সে বলবেই বা কী? স্বাগতার সঙ্গে কেন তার সম্পর্ক বিষিয়ে গিয়েছিল? কেন তারা পরস্পরকে দুটো বুনো জন্তুর মতো আঁচড়েছে কামড়েছে? সে তো তার আর স্বাগতার ব্যাপার, মেয়েকে এসব শোনাবে কেন? স্বাগতা যদি মেয়ের কানে বিষ ঢেলেও থাকে, তিন লাইন কৈফিয়ত গেয়ে সেই বিষ কি নামাতে পারবে রঞ্জন? ডিভোর্সের পর সে যে কতবার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, এমনকী স্বাগতা ফের বিয়ে করার পরও বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, এসব কথাই বা আজ মিমিকে বলে কি এমন মোক্ষলাভ হবে? মেয়ে যে তার প্রতি কতটা বিরূপ, যে তো তার অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট, ফালতু ফালতু সাফাই গেয়ে কেন মুখ নষ্ট করবে রঞ্জন? বরং মেয়ে যে এত বছর পর তার কাছে এল, এই সুখটুকুকেই তো সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে এখন। বাদানুবাদে না গিয়ে।

রঞ্জন সোজা হয়ে বসল। গলা ঝেড়ে বলল, ওকে। ইটস অলরাইট।... কিন্তু তুমি যে টাকাটা নেবে না, তোমার মা জানে তো?

—জেনে যাবে।

—ও।... এখনো মাকে বলোনি তাহলে?

—দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। ইটস বিটুইন আমি আর মা। আমি না চাইলে মা কক্ষনো এই টাকা নিতে আমায় ফোর্স করবে না।

রঞ্জন মনে মনে বলল, বটেই তো। রঞ্জনের মুখে আর-এক পোঁচ কালি বোলানোর সুযোগ স্বাগতা থোড়াই ছাড়বে। হয়তো মেয়ের পিঠ চাপড়ে বলবে, বহুত আচ্ছা। অসভ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন বদমাইশটার মুখের ওপর পলিসিটা ছুড়ে মেরে আয়।

তা এসব ভাবনা অবশ্য রঞ্জনকে সেভাবে বিচলিত করে না আজকাল। ধুস, কষ্ট পাওয়ার সেই কুৎসিত ধাপগুলো তো সে কবেই পেরিয়ে এসেছে। এখন তো সে প্রায় গন্ডারেরই সগোত্র। তাও আবার শিংভাঙা।

ম্লান হেসে রঞ্জন বলল, ঠিক আছে। এতই যখন আপত্তি, নিও না টাকা। আমার তো তোমার ওপর কোনো জোর নেই।

—নেই-ই তো। মিমির স্বর রুক্ষতর, আমারও আপনার ওপর কোনো

জোর নেই। আর নেই বলেই ও টাকা টাচ করা আমার উচিত হবে না।

—ব্যস ব্যস ব্যস, ম্যাটার ইজ সেটলড। দুহাত তুলে মিমিকে থামাল রঞ্জন। অনুনয়ের সুরে বলল, এবার একটু রিল্যাক্স করো। বলো কী নেবে? চা? না কফি? আমি কিন্তু দুটোই ভাল বানাই।

—সরি। আমি এখানে আপ্যায়িত হতে আসিনি।

—আহা, উত্তেজিত হচ্ছো কেন? বি লজিক্যাল। রঞ্জন মাথাটাকে একদম বরফ করে ফেলল। মিমির বুনো ঘোড়ার মতো হাবভাব দেখে এবার যেন একটু মজাই লাগছে তার। হাসি হাসি মুখে বলল, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো না, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?

—করি না-ই তো।

—অর্থাৎ আমরা পরস্পরের অনাত্মীয়। রাইট?

—অবশ্যই।

—আমরা কি পরস্পরের শত্রু? তাও তো নয়। ঠিক?

মিমি থতমত। চোখ পিটপিট করছে।

—তাহলে কী দাঁড়াল। অনাত্মীয় এবং শত্রু নয় এমন একজন আমার বাড়ি এসেছে। সে তাহলে আমার গেস্ট। অতিথিকে আপ্যায়ন করা কি গৃহস্বামীর কর্তব্য নয়? অন্তত প্রথম দিন?

মিমি চোখ কুঁচকে তাকিয়ে। বুঝি-বা পড়তে চাইছে রঞ্জনকে। দেখতে দেখতেই নাক কুঁচকে গেল হঠাৎ। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। বিড়বিড় করে বলল, কিসের একটা পোড়া-গন্ধ আসছে না?

—হ্যাঁ, তাই তো। রঞ্জনও চমকেছে।—গ্যাসে ডিম-আলু বসিয়েছিলাম। গেল বোধহয়।

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। যা ভেবেছে তাই, জল ফুটে মরে গেছে কখন, শুকনো কড়া পুড়ছে চড়চড়। তাদের বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মতো। আপনমনে হাসল রঞ্জন। ঝটিতি নেবাল গ্যাস। সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কড়া নামাল সিংকে। দীর্ঘশ্বাস চেপে ফিরছিল ড্রয়িংস্পেসে, থমকাল হঠাৎ।

মিমি সোফায় নেই!

মিমি দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে!

মিমি গভীর মনোযোগে দেখছে টাঙানো ছবিটা!

কিছু কি মনে পড়ছে মিমির? শৈশবের কোনো স্মৃতি? একটু কি মেদুর হল মিমির মন?

রঞ্জন গলা খাঁকারি দিল, ছবিটা এখানেই তোলা। তোমার বড়মামার ক্যামেরায়। এই ফ্ল্যাটটা তখন সদ্য কেনা হয়েছে।

বিদ্যুৎলতার মতো সোফায় ফিরে গেল মিমি। যেন রঞ্জনের কথাগুলো কানেই যায়নি এমন একটা ভান করে বলল, আপনার ডিম-আলুর কী খবর? অবশিষ্ট আছে কিছু?

—নাহ্। জ্বলে-পুড়ে খাক।

—মা আপনার সম্পর্কে ঠিকই বলে।

—কী বলে?

—সে আপনি শুনে কী করবেন?

—কী বলে আমি জানি। আমি সংসার করার অযোগ্য। তাই তো?

—ভুল বলে কি? মিমি টেরিয়ে তাকাল, রোজ কি এরকমই রান্নাবান্না হয়?

মেয়ের সামনে নিজেকে একজন দুঃখী-অসহায় মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে বাধছিল রঞ্জনের। তাছাড়া সে তো এখন সত্যিই তেমন একটা খারাপ নেই, বরং এক ধরনের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মিছিমিছি বাচ্চা মেয়েটার সহানুভূতি কাড়ার অপচেষ্টা সে করবেই বা কেন!

রঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠল, রোজ এরকম হাল হলে কবেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যেতাম। আমার রাঁধার সময় কোথায়! লোক একজন আছে, সে যা বানিয়ে দেয় তাই সোনামুখ করে খেয়ে নিই। সে ডুব মারলে তবেই এই আপনা-হাত জগন্নাথ।

—আজ তো রান্নার বারোটা। আজ কী হবে?

—ইচ্ছে হলে আবার বসাব। কিংবা মুড়ি চিবাবো। অথবা টোস্ট-ওমলেট। বাইরে থেকেও খেয়ে আসতে পারি। ফোন করে খাবার আনিয়েও নেওয়া যায়। আর কোনোকিছুরই মুড না থাকলে এবেলা স্রেফ হরিমটর।

—বুঝলাম। মিমি একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর ঔদাসীন্যের

প্রলেপমাখা গলায় বলল, তা এরকম একা একা থাকার দরকারটা কী?

—এই বয়সে দোকা জোটাব কোত্থেকে? জানো, নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে আমি হাফ সেঞ্চুরি করব?

—অনেক আগেই তো বন্দোবস্তটা করতে পারতেন।

—তা হয়তো পারতাম। রঞ্জনের মুখে একটা ছদ্ম-করুণ ভাব এবার, কিন্তু একজনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম যে।

মিমির চোখ সরু, কে সে?

রঞ্জন মনে মনে বলল, তুই-তুই-তুই।

মুখে রহস্যের হাসি টেনে বলল, এতটা পারসোনাল কথা তোমায় বলে ফেলব, এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

—সরি। মিমি পলকে গোমড়া। চোয়াল শক্ত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার জানার প্রয়োজনও নেই।

কী কাণ্ড, চটে গেল কেন? মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি দেখে রঞ্জনের চোখ চিকচিক। নরম গলায় বলল, কুল। কুল। ফ্রিজে একটা কোল্ডড্রিংকস আছে, দেবো?

মিমির জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের ঢাউস বোতলখানা বের করে আনল রঞ্জন। দুখানা গ্লাসও। তরল ঢেলে একটা গ্লাস মিমিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, চুমুক দাও।

গ্লাসটা ধরল মিমি, তবে খাচ্ছে না, ভাবছে কী যেন।

রঞ্জন মেয়ের মুখোমুখি বসল, এবার আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—কী?

—তুমি তো বললে মাকে জানিয়ে আসোনি, তাহলে এ বাড়ির ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?

—পেয়েছি। যেখান থেকে হোক।

—তবু শুনি।

মিমি ঠোঁট বেঁকাল, আপনাকে এতোসব কথা বলব এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

রঞ্জন হেসে ফেলল। চোখ নাচিয়ে বলল, আমি অবশ্য সোর্সটা আন্দাজ করতে পেরেছি। বিমার পলিসিতে এ বাড়িরই অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল।

মিমি গোঁজ। ছোট্ট করে চুমুক দিল কোল্ডড্রিংকসে। বুঝি-বা অস্বস্তি গোপন করতে।

—এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। রঞ্জনের হাসি চওড়া হল, পলিসিটা ছিল তোমার মা-র জিম্মায়। সামহাউ তুমি সেটি দেখে ম্যাচিওরিটির ডেটটা জানতে পেরেছ। কিন্তু ইনশিওরেন্স কোম্পানি তো টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত চিঠি এ বাড়ির ঠিকানাতেই পাঠাবে, সেই চিঠি পেয়ে আমি তোমার মা-র কাছ থেকে অরিজিনাল পলিসিটা চাইব, বিমা-অফিসে জমা করব, তারপর চেক আসবে, তারও পরে তোমার টাকা পাওয়ার প্রশ্ন। এবং তার যথেষ্ট দেরি আছে।....তুমি সাত তাড়াতাড়ি নেব না নেব না করে ওপরপড়া হয়ে ছুটে এসেছ কেন?

মিমি দু-সেকেন্ড চুপ। তারপর গলায় ভারিক্কি ভাব এনেছে।

—আমি পরে কোনো এমব্যারাসিং সিচুয়েশনে পড়তে চাই না।

—হুম।...তা পলিসিটা একেবারে হাতে করে নিয়ে চলে এলেই তো পারতে।

—পরে পোস্টে পাঠিয়ে দেবো। কিংবা কুরিয়ারে। আজ ডিসিশনটা জানিয়ে গেলাম।

—ও।...কিন্তু আমার একটা খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল যে।

—কিসের খুঁতখুঁতুনি?

—পলিসিটা আমি করেছিলাম আমার দুবছরের মেয়ের নামে। আমার ছোট্ট মিমিকে ওটা উপহার দিয়েছিলাম। গিফট ফেরত নেব?

—সে আপনার ব্যাপার। মিমির গলা যেন দুলে গেল সহসা। পরক্ষণে ঠোঁট কামড়েছে, ইচ্ছে হলে টাকাটা কোনো অনাথাশ্রমেও দান করে দিতে পারেন।

—সে তো মিমি নিজেও দিতে পারে।

—সরি। আপনার টাকায় নাম কেনার বাসনা মিমির নেই।

কী অবলীলায় বাবাকে অপমান করে চলেছে মেয়ে। রঞ্জনের বুকের

মধ্য দিয়ে শুকনো বাতাস বহে গেল। দুলে উঠছে পুরনো পুরনো ছবি। স্বাগতার বাপের বাড়িতে মিমিকে ফোন করেছে রঞ্জন, তোতাপাখির মতো মিমি দূরভাষে আওড়াচ্ছে, তুমি দুষ্টু, তুমি খারাপ, তুমি কক্ষনো আমায় ফোন করবে না...। মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে স্বাগতার বাড়ি ছুটে গেছে রঞ্জন, দরজা খুলে স্বাগতা রক্তচক্ষু, ফের তুমি জ্বালাতে এসেছ? ডাকব মেয়েকে, শুনবে সে তোমার কাছে যেতে চায় কিনা...! মায়ের হাত চেপে আছে মিমি, কটকট বলছে, তুমি পচা, তুমি ভাল নও, একদম আমার কাছে আসবে না...। কোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারপরও হয়তো জোর করে মেয়েকে দেখতে চাইতে পারত রঞ্জন, কিন্তু কাকে দেখবে সে? স্বাগতা আবার বিয়ে করার পর অনেকে বলেছিল, এবার তুই কোর্ট থেকে মেয়ের কাস্টডি চেয়ে নে। রঞ্জনের সাহসে কুলোয়নি। মেয়ে যদি আবার মুখের ওপর না বলে দেয়! আবার যদি শেখানো বুলি উগরে দেয়!

এখনো কি শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে মিমি? মনে হয় না। ছোটবেলা থেকে কোনো ধারণা মগজে গেঁথে দিতে পারলে তা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হয়। স্বাগতা সফল। মেয়ে এখন সত্যিই মন থেকে ঘৃণা করে বাবাকে।

শুকনো বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে একরাশ জলভরা মেঘ ঢুকে পড়ল বুকে। হায় রে, মিমি তো রঞ্জনকে বাবা বলে মানেই না। লোনামুখে রঞ্জন শুনেছে স্বাগতার বরকেই বাপি বলে ডাকে মিমি। ওই সংসারে মিমি এখন পুরোপুরি থিতু, রঞ্জন তার কাছে এক অস্বস্তিকর অস্তিত্ব মাত্র।

ভেতরের সাইক্লোনটিকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাগে আনল রঞ্জন। গলা ঝেড়ে বলল, ঠিক হ্যায়। সে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন। এবার তোমার কথা একটু বলো।

খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল মিমি, আমার আবার কী কথা?

—তুমি তো বি এসসি পার্ট ওয়ান দিয়েছ, তাই না? বটানি অনার্স?

—অনেক খবর রাখেন তো!

—কানে এসে যায়। বি এসসির পর কী ইচ্ছে? এম এসসি করবে তো?

—হয়তো।

—তারপর রিসার্চ? অ্যাকাডেমিক লাইনেই থাকতে চাও?

—ঠিক নেই। রেজাল্টের ওপর ডিপেন্ড করছে। বলেই মিমি সচকিত, আপনি জেনে কী করবেন?

—এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

—মিনিংলেস কিউরিসিটি। বলেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি, থ্যাংকস ফর দ্য কোল্ডড্রিংকস। ঘরে ডাকার জন্যও ধন্যবাদ। চলি।

—চলি বলতে নেই মিমি। বলো আসি।

মিমি ঘাড় কাত করে শুনল কথাটা। তারপর পায়ে পায়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে।

রঞ্জনের বুকটা হু হু করে উঠল। পেছন থেকে ডেকে উঠেছে, মিমি?

—কিছু বললেন?

—একটা রিকোয়েস্ট করব? রঞ্জনের গলা কেঁপে গেল, রাখবে?

—কী?

—পলিসিটা পোস্ট-ফোস্টে নয় না-ই পাঠালে। কোথায় কীভাবে হারিয়ে যায়...। তুমি কুরিয়ার হয়ে এসে দিয়ে যেও।

মিমি চোখে চোখ রাখল। তাকিয়েই আছে। রঞ্জনের চোখে কী খোঁজে মিমি? কিছু কি পেল দেখতে?

রঞ্জন ফের বলল, আসবে তো?

উত্তর না দিয়ে মিমি দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে। নামছে। এক-পা এক-পা করে।

রঞ্জন দ্রুত বেরিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকল। দেখছে মেয়ের চলে যাওয়া। হঠাৎই রঞ্জন বিমূঢ়। দেড়তলার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে রুমাল বের করল। মুখ নয়, ঘাম নয়, চোখ মুছছে। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইশারায় ঝট করে একবার তাকাল ওপরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে নেমে গেল বাকি সিঁড়িটুকু।

রঞ্জনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। ইস, নিজের মেয়েকে বুঝতে এতটা সময় লেগে গেল! ♣